ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 853- 859
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.298

শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসে জ্যাঠাইমা: কাহিনি বিন্যাসে এক প্রভাবশালী চরিত্রের মূল্যায়ন

নিরঞ্জন মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the novel 'Pallisamaj' a vivid and realistic reflection of rural life and its social crises is prominently observed. Various forms of social conflict, tension, superstition, and class-based divisions within the rural community are clearly depicted. Alongside highlighting the problems inherent in the social structure, the novel also explores the possibilities of social reconstruction, where women play a significant representative role. The objective of this research paper is to analyze the representative position of women in 'Pallisamaj' and to examine how their roles are reflected in the process of social reconstruction. The novel demonstrates that women in rural society are not confined merely to the domestic sphere; rather, they serve as important bearers of social values, morality, and human compassion. The empathy, self-sacrifice, moral strength, and social awareness of women function as powerful forces in resolving social crises. Furthermore, through the portrayal of female characters, the novelist illustrates that the presence and active participation of women are essential for bringing about social change. At times, they emerge as voices of protest, while at other times they act as supportive forces in promoting social reform and education. Thus, women are not merely passive members of society but emerge as crucial representatives in the process of social reconstruction. This research aims to discuss the role, social position, and representative significance of women in 'Pallisamaj'. Through this analysis, it becomes evident that women play a profoundly important and relevant role in resolving social crises and in building a humane and progressive society.

Keywords: Social Conflict, Superstition, Social Crisis, Social Reform, Women's Representation

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার এক বাস্তবসম্মত প্রতিচিত্র। যেখানে সমাজের নানা সংকট, দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারীর অবস্থান ও ভূমিকা, যা কেবল পারিবারিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বৃহত্তর সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে

আবদ্ধ থেকেও নারীরা কীভাবে নৈতিকতা, সহমর্মিতা ও মানবিক মূল্যবোধের ধারক হিসেবে সমাজকে নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম 'পল্লী-সমাজ'-এ তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে নারীরা একদিকে যেমন সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের শিকার, অন্যদিকে তেমনি তারা এই প্রতিকূলতার মধ্যেই মানবিকতা ও ন্যায়বোধের শক্ত ভিত্তি রচনা করেছে। জ্যাঠাইমার মতো চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে একজন নারী তার প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সমাজের সংকীর্ণতা ভেঙে একটি বৃহত্তর মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারেন। তার বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় যে, সমাজের সমস্যাগুলির মূলে রয়েছে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও অজ্ঞতা এবং এই উপলব্ধি সমাজ পুনর্গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, নারীদের এই প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থান কেবল ব্যক্তি বা পারিবারিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা সমাজের নৈতিক কাঠামোকে পুনর্গঠিত করার এক অন্তর্নিহিত শক্তিতে পরিণত হয়। তারা সরাসরি ক্ষমতার অধিকারী না হলেও, তাদের চিন্তা, মূল্যবোধ ও সহানুভূতির মাধ্যমে সমাজের গতিপথকে প্রভাবিত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসে নারীর উপস্থিতি এক ধরনের নৈতিক নেতৃত্বের প্রতীক, যা সমাজ পরিবর্তনের এক অনিবার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অতএব, 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসের নিরিখে নারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থান বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, সমাজ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা নীরব হলেও অত্যন্ত গভীর ও প্রভাবশালী। এই প্রবন্ধে সেই ভূমিকার বহুমাত্রিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

এই আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে উপন্যাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কীভাবে বিশ্বেশ্বরী দেবী একজন সমাজ পুনর্গঠনের কান্ডারী হয়ে উঠেছেন। একটা সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য তিনি কীভাবে রমেশকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন আবার রমাকেও তিনি জমিদারির প্রশাসনিক জটিলতা থেকে একটি সুন্দর জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আসলে বিশ্বেশ্বরী দেবী সকলের অন্ধকার দূর করার প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। উপন্যাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোকে উপলব্ধি করতে পারা জায় যে বিশ্বেশ্বরী দেবী কীভাবে এক অনন্য সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি কেবল তাত্ত্বিকভাবে নয়, বাস্তব কর্মধারার মধ্য দিয়েই সমাজ পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি রমেশকে ধীরে ধীরে আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধে গড়ে তুলেছেন। একই সঙ্গে রমাকেও তিনি জমিদারির জটিল প্রশাসনিক পরিসর থেকে সরিয়ে এনে এক স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন। মূলত, বিশ্বেশ্বরী দেবীর চরিত্রে এক আলোকবর্তিকার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া গিয়েছে— যিনি নিজের প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা ও দৃঢ় মানসিকতার মাধ্যমে চারপাশের অন্ধকার দূর করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন সাধনাই তাঁকে সমাজ পুনর্গঠনের এক প্রকৃত কান্ডারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পল্লী গ্রামের দুই জমিদার পরিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেছেন। দুই পরিবারের জমিদারি রক্ষার লড়াইকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পল্লী সমাজের সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। যেখানে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে চেনা যায় বিশ্বেশ্বরী দেবীর সামাজিক জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে। উপন্যাসের চরিত্র গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস, বেনী ঘোষাল এদের প্রত্যেকের চরিত্রের অন্ধকার দিকটি বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ের একজন গৃহবধূ কীভাবে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে পারেন তা বিশ্বেশ্বরী চরিত্রটির নির্মাণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। সমাজের মূল সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে এক নতুন

সমাজ গড়ে তোলার কথা আমরা জানতে পারি। শত বাঁধার মধ্য দিয়েও জ্যাঠাইমা নিজের লক্ষ্যে সর্বদা অবিচল থেকেছেন। নিজের সন্তান অর্থাৎ বেণী ঘোষালের কুকর্মে তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত হলেও সন্তানের প্রতি স্নেহ কখনও কমে যায়নি। তবে তিনি যখন বুঝতে পেরেছেন যে নিজের সন্তানের পরিবর্তন হওয়া একেবারেই অসম্ভব তখন তিনি সংসারকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে সন্তানকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এভাবেই জগত সংসারকে আর এক নতুন সংকটের মুখোমুখি করে জ্যাঠাইমা এই শিক্ষাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, সংসারের পক্ষে যা কিছু মন্দ তা পরিত্যাগ করাই সংসারের জন্য মঙ্গল। তা যতই অনেক আপন হোক তবুও আমাদের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্যই তা পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবেই অন্দরমহলের এক নারীকে বৃহত্তর সমাজ গঠনের কারিগর হিসেবে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গড়ে তুলেছেন। সামাজিক নিয়মে এই সমাধান চিরন্তন নয়, কালের নিয়মে সব সময়ই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর দুষ্ট চক্রান্তকারী মানুষেরা গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আবারও সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের খাড়া নামিয়ে আনবে আর তখনই প্রয়োজন হবে শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের এই বলিষ্ঠ নারীদের। যাঁরা অন্তরে থেকেও বাহিরকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পান। যখনই সমাজের উপর কালো মেঘের ছায়া পড়েছে তাঁরা বুঝতে পারেন তখনই নিজেদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই সমাজকে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে দেন। তাইতো জ্যাঠাইমা রমেশ কে বলেছিল, রমেশ তাঁকে ডাকেনি, তিনি নিজেই এসেছেন। অর্থাৎ ভালো কাজ করবার জন্যে অন্যের আহ্বানের প্রয়োজন হয় না, নিজের উদ্যোগেই মানুষ এগিয়ে আসে। সমাজের সকল মুখোশধারীদের মুখোশ টেনে খুলে দেয় সাধারণ মানুষ আর তখন দেখতে পায় সেই মানুষগুলির প্রকৃত চেহারা। তাইতো বিশ্বেশ্বরী অর্থাৎ রমেশের জ্যাঠাইমা রমেশকে সমাজের শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। আমরা এইরকম আরও অনেক ঘটনা যা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করে বোঝার চেষ্টা করেছি প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি কীভাবে সমাজকে আরও একটু এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে।

জ্যাঠাইমার কথার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি রমেশকে বোঝাতে চান যে গ্রামের মানুষদের আচরণ যতই সংকীর্ণ বা স্বার্থপর মনে হোক, তার মূল কারণ তাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং দুর্বলতা। এই বক্তব্যে নারীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট। জ্যাঠাইমা এখানে একজন সমাজসংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি সমস্যাকে দোষারোপ না করে তার কারণ বিশ্লেষণ করছেন। নারীর এই সহানুভূতিশীল মনোভাব সমাজ পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য। রমেশ প্রথমে গ্রামবাসীদের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেও, জ্যাঠাইমার কথায় তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ, নারী এখানে পরিবর্তনের প্রেরণা। সমাজের অশিক্ষা ও সংকীর্ণতা দূর করতে হলে ঘৃণা নয়, বরং সহানুভূতি ও বোঝাপড়া দরকার, এই শিক্ষা জ্যাঠাইমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে বোঝা যায়, নারীরা শুধু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তারা সমাজের নৈতিক দিশারী হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রমার সততা ও নৈতিকতার প্রতি সমাজের বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। গোপাল সরকারের কথায় বোঝা যায়, রমা একজন নারী হয়েও সম্পত্তির ন্যায্য বণ্টনের ক্ষেত্রে এক নির্ভরযোগ্য চরিত্র। সে অন্যায়ভাবে কারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে না, এই বিশ্বাস সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে নারীর প্রতিনিধিত্ব শুধু গৃহস্থলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। রমা ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই ধরনের নৈতিক নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমাজের ভিত শক্ত হয় তখনই যখন সেখানে বিশ্বাস ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অংশে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে নারী শুধু আবেগপ্রবণ সত্তা নয়, বরং তারা ন্যায়বিচারের রক্ষকও হতে পারে।

রমার চরিত্র সমাজে এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে নারী সততা ও নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজকে সুসংগঠিত করতে পারে। মানবজীবনের মূল্যবোধকে সম্পত্তির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্যাঠাইমা এখানে রমাকে সতর্ক করছেন, বিষয়-সম্পত্তির জন্য যেন রমেশের মতো মানুষের জীবন ও আদর্শ নষ্ট না হয়। এটি নারীর দূরদর্শিতা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যখন মানুষ সম্পত্তি ও স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়, তখন সমাজে দ্বন্দ্ব ও অবক্ষয় সৃষ্টি হয়। জ্যাঠাইমা সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এই অংশে নারী চরিত্রটি সমাজের নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে। তিনি শুধু পরিবার নয়, বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের কথা ভাবছেন। তাঁর এই মানবিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়ক। ফলে বোঝা যায়, নারীরা সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য শক্তি। রমেশের মানসিক পরিবর্তন প্রকাশ পেয়েছে, যা জ্যাঠাইমার শিক্ষার ফল। তিনি বুঝতে পারেন যে গ্রামবাসীদের উপর রাগ করা অর্থহীন, কারণ তাদের সংকীর্ণতা আসলে অজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবের ফল। এখানে নারীর প্রভাব পরোক্ষভাবে কাজ করছে। জ্যাঠাইমার চিন্তাধারা রমেশকে আত্মবিশ্লেষণে সাহায্য করেছে। ফলে সে সমাজকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে। এই উপলব্ধি সমাজ পুনর্গঠনের মূল ভিত্তি। কারণ, পরিবর্তন শুরু হয় নিজের চিন্তাভাবনা থেকে। নারীর প্রেরণায় এই আত্মজ্ঞান সম্ভব হয়েছে। তাই বলা যায়, নারী এখানে সমাজ পরিবর্তনের প্রাথমিক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। উপন্যাসের একটি কেন্দ্রীয় দর্শন। এখানে 'আলো' বলতে বোঝানো হয়েছে শিক্ষা, জ্ঞান ও সচেতনতা। জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন, অন্ধকার দূর করার একমাত্র উপায় হল জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। নারীর এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রগতিশীল। তিনি কোনো কঠোর শাসন বা দমননীতি নয়, বরং শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই চিন্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে, তার বিচারবুদ্ধি উন্নত করে। জ্যাঠাইমা এখানে একজন আলোকপ্রদর্শক। তার এই আহ্বান নারীর নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। পল্লীসমাজের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রমেশ উপলব্ধি করে যে, একসময়ের আদর্শ গ্রামীণ সমাজ এখন মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। এই উপলব্ধির পেছনে জ্যাঠাইমার শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নারী এখানে সমাজের পতনের কারণ বুঝতে সাহায্য করেছে এবং পুনর্গঠনের পথ দেখিয়েছে। এই অংশে সমাজের ভণ্ডামি ও সংকীর্ণতার সমালোচনা করা হয়েছে। নারী চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন যে, সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে তার অন্তর্গত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা জরুরী। জ্যাঠাইমার দৃঢ়তা ও নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রমেশকে পালিয়ে যেতে নিষেধ করেন এবং তাকে সমাজসেবার কাজে অবিচল থাকতে উৎসাহিত করেন। নারীর এই দৃঢ়তা সমাজ পুনর্গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরিবর্তনের পথে বাধা আসবেই। সেই বাধা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও স্থিরতা, যা জ্যাঠাইমার মধ্যে বিদ্যমান। তিনি এখানে একজন পথপ্রদর্শক ও প্রেরণাদাত্রী। তার এই ভূমিকা প্রমাণ করে যে, নারীরা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। এই উক্তিতে কঠোর বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়। জ্যাঠাইমা বোঝাতে চান যে, কিছু পরিবর্তন শুধুমাত্র কোমল পদ্ধতিতে সম্ভব নয়, কখনও কখনও কঠোর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এখানে নারী চরিত্রটি বাস্তববাদী। তিনি শুধু আদর্শবাদী নন, বরং বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে জানেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সব সমস্যার সমাধান একরকম নয়। কখনও কঠোরতা, কখনও সহানুভূতি, উভয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। জ্যাঠাইমা সেই ভারসাম্য রক্ষা করছেন। এই অংশে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। রমা তার সন্তানের দায়িত্ব রমেশের হাতে তুলে দিয়ে তার আদর্শে মানুষ করার আহ্বান জানিয়েছে। এখানে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের

কথাও ভাবছেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও আদর্শের গুরুত্ব এই অংশে স্পষ্ট। নারী এখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নির্মাতা হিসেবে উপস্থিত। রমার কথায় বোঝা যায় যে, রমেশের প্রচেষ্টা সফল হবে এবং সমাজে পরিবর্তন আসবেই। নারী এখানে আশার প্রতীক। তিনি পরিবর্তনের প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং অন্যদেরও সেই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আশা ছাড়া কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। রমার এই বিশ্বাস সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায়। রমেশের আত্মবোধের সূচনা দেখা যায়। সে উপলব্ধি করে যে, যদি সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তবে সমাজের সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান হবে না। জ্যাঠাইমার কথার প্রভাবেই তার এই উপলব্ধি জন্মায়। এখানে নারী চরিত্রটি সমাজ পরিবর্তনের অনিবার্যতার কথা তুলে ধরে। এই বক্তব্যে বোঝা যায়, সমাজের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হয় না। বরং সমস্যার মধ্যেই থেকে কাজ করতে হয়। জ্যাঠাইমা রমেশকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। ফলে নারী এখানে সমাজের স্থায়ী শক্তি, যিনি মানুষকে দায়িত্ববান করে তোলেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরিবর্তন আনতে হলে সমাজের ভেতরেই কাজ করতে হয়। নারীর এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম ভিত্তি। জ্যাঠাইমার আত্মসমালোচনার দিকটি ফুটে ওঠে। তিনি মনে করেন, রমেশের জেল হওয়ার পেছনে তার নিজেরও কিছু দায় আছে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এটাও উপলব্ধি করেন যে, এই শাস্তি রমেশের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। এখানে নারীর গভীর আত্মজ্ঞান ও বাস্তববোধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজের ভুল স্বীকার করতে জানেন, আবার বৃহত্তর কল্যাণের দিকটিও বিবেচনা করেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই মানসিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভুল স্বীকার না করলে কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। জ্যাঠাইমার এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছে যে, নারী সমাজের নৈতিক বিচারক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জ্যাঠাইমার আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, রমেশ তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি করবে এবং আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে। এখানে নারী চরিত্রটি দূরদর্শী। তিনি জানেন যে, জীবনের কষ্ট ও অভিজ্ঞতা মানুষকে পরিপক্ক করে তোলে। তাই তিনি এই ঘটনাকে নেতিবাচক হিসেবে না দেখে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করে ছেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই আশাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরিবর্তনের পথে ব্যর্থতা বা কষ্ট আসবেই। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাওয়াই প্রকৃত উন্নতির পথ। নারী এখানে সেই দৃষ্টিভঙ্গির বাহক। রমার ন্যায়বোধ ও প্রশ্ন করার সাহস প্রকাশ পেয়েছে। সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে এবং রমেশের শাস্তিকে ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারে না। এখানে নারী চরিত্রটি প্রতিবাদী রূপে উপস্থিত। সে শুধু নিয়ম মেনে চলা নয়, বরং ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে চায়। এই মনোভাব সমাজ পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কারণ, প্রশ্ন ছাড়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে না। রমার এই অবস্থান প্রমাণ করে যে, নারী সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। ভবিষ্যতের এক ইতিবাচক চিত্র আঁকা হয়েছে। জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন যে, রমেশ ফিরে এসে দেখবে সমাজ তার জন্য প্রস্তুত, মানুষ তাকে চিনেছে এবং ভালোবেসেছে। এখানে নারী চরিত্রটি আশার প্রতীক। তিনি সমাজের পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে আসেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই আশাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরিবর্তনের জন্য মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জাগানো প্রয়োজন। জ্যাঠাইমা সেই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন। গ্রামীণ সমাজের বিচারব্যবস্থা ও কর্তৃত্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। রমেশের প্রতি সমাজের আস্থা এখানে স্পষ্ট। এখানে বোঝা যায়, একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সমাজ কীভাবে গ্রহণ করে। নারীর প্রেরণায় রমেশ যে আদর্শে গড়ে উঠেছে, তার ফলস্বরূপ সমাজ তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ, নেতৃত্বের প্রতি আস্থা না থাকলে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। রমার মাতৃত্ববোধ ও আদর্শবোধ প্রকাশ পেয়েছে। সে তার সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চায়, যাতে সে রমেশের মতো নিঃস্বার্থ ও আদর্শবান হয়। এখানে নারী ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের প্রধান কারিগর। তিনি শুধু সন্তানের লালন-পালনই করেন না, বরং তাকে আদর্শে গড়ে তোলেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মই সমাজের ধারক ও বাহক। নারীর এই দায়িত্ব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। বংশগত আদর্শ ও মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে। রমা বিশ্বাস করে যে, তার সন্তানের মধ্যে পূর্বপুরুষদের ত্যাগের গুণ বিদ্যমান। এখানে নারী চরিত্রটি মূল্যবোধের ধারক হিসেবে উপস্থিত। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে এই গুণাবলি বিকশিত করা সম্ভব। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমাজের উন্নতির জন্য ত্যাগ ও আদর্শ অপরিহার্য। সমাজের ভুল ও তার সংশোধনের প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। রমা স্বীকার করেছে যে, তারা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রমেশকে কষ্ট দিয়েছে। এখানে নারীর আত্মসমালোচনার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজের ভুল বুঝতে এবং তা সংশোধন করতে প্রস্তুত। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভুল স্বীকার না করলে উন্নতি সম্ভব নয়। রমেশের পূর্ণ রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। সে আর বাইরের কেউ নয়, বরং সমাজেরই একজন অংশ হয়ে উঠেছে। এখানে নারী চরিত্রটি এই পরিবর্তনের স্বীকৃতি দিচ্ছে। রমার কথায় বোঝা যায় যে, রমেশ এখন সত্যিকারের সমাজসেবক। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমাজের ভেতর থেকেই পরিবর্তন আনতে হয়।

'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা কেবল সহায়ক নয়, বরং নেতৃত্বমূলক ও দিকনির্দেশনামূলক। গ্রামীণ জীবনের নানা সংকট, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে নারী চরিত্রগুলি মানবিকতা, সহমর্মিতা এবং বাস্তববোধের মাধ্যমে সমাজকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছে। উপন্যাসের নারী চরিত্ররা প্রথাগত গণ্ডি অতিক্রম করে সমাজের অন্তর্গত সমস্যাগুলিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে এবং তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। বিশেষত জ্যাঠাইমার মতো চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, নারীর দৃষ্টিভঙ্গি কতটা সংবেদনশীল ও বাস্তবসম্মত হতে পারে। তিনি কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র গ্রামীণ সমাজের সমস্যার মূল কারণ দারিদ্র্য ও অশিক্ষা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই উপলব্ধিই সমাজ পুনর্গঠনের প্রথম ধাপ। নারীরা এখানে প্রতিবাদী না হয়েও পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া, নারী চরিত্রগুলির মধ্যে যে নৈতিক দৃঢ়তা ও মূল্যবোধের চেতনা লক্ষ্য করা যায়, তা সমাজের ভাঙন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা সম্পর্ক রক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজের পুনর্গঠন কেবল বাহ্যিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ মানসিক ও নৈতিক রূপান্তর, যা নারীর মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসে নারীরা নিছক গৃহবন্দী চরিত্র নয়, বরং তারা সমাজের পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি। তাদের চিন্তা, মূল্যবোধ ও মানবিকতা গ্রামীণ সমাজকে একটি সুস্থ, সচেতন ও সমন্বিত রূপ দেওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থান সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। গুপ্ত, ক্ষেত্র। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থনিলয়, ১৯৯৫, কলকাতা।

২। চক্রবর্তী, সুমিতা। উপন্যাসের বর্ণমালা (তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)। পুস্তক বিপণি, ২০১৬, কলকাতা।

৩। চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চন্দ্র। পল্লী-সমাজ (অষ্টম মুদ্রণ)। ইণ্ডিয়ান অ্যাসসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৫২, কলকাতা।

৪। চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। উপন্যাসের রূপরীতি (পুনর্মুদ্রণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, কলকাতা।

৫। দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা কথাসাহিত্যের একাল। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮, কলকাতা।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (ষষ্ঠ সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, কলকাতা।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাস: দ্বান্দ্বিক দর্পণ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, ১৯৯৬, কলকাতা।

৮। ভট্টাচার্য, দেবীপদ। উপন্যাসের কথা (দ্বিতীয় সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, কলকাতা।

৯। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর: ১৯২৩-১৯৯৭ (ষষ্ঠ সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, কলকাতা।

১০। রায়, অলোক। সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য (পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ)। সাহিত্যলোক, ২০১০, কলকাতা।

১১। রায়, গোপিকা নাথ। বাংলা কথাসাহিত্য: প্রকৃতি ও প্রবণতা। পুস্তক বিপণি, ১৯৯১, কলকাতা।

১২। রায়, দেবেশ। উপন্যাস নিয়ে (চতুর্থ সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, কলকাতা।

১৩। রায়, দেবেশ। উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, কলকাতা।

১৪। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা (পুনর্মুদ্রণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, কলকাতা।

১৫। সেনমজুমদার, জহর। উপন্যাসের ঘরবাড়ি (দ্বিতীয় প্রকাশ)। পুস্তক বিপণি, ২০২৩, কলকাতা।

১৬। শিকদার, অশ্রুকুমার। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস (চতুর্থ সংস্করণ)। অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮, কলকাতা।

১৭। সামন্ত, সুবল সম্পাদনা। বাংলা উপন্যাস: বীক্ষা ও অন্বীক্ষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)। এবং মুশায়েরা, ২০১১, কলকাতা।